



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 921 - 926

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্রনাথের ‘পারস্যে’ ভ্রমণবৃত্তান্ত : সমকালীন ভারতবর্ষ - সাম্প্রদায়িক সমস্যা – রবীন্দ্র ভাবনা

ড. মোহাম্মদ লতিফুল ইসলাম

সহকারী অধ্যাপক

এস. বি. এস. গভর্নমেন্ট কলেজ, হিলি, দক্ষিণ দিনাজপুর

Email ID: mdlatifulislam2010@gmail.com

 0009-0008-6969-7121

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Contemporary
India,
Travelogue,
Communal
Issues, Bharat-
Bhavna,
Statecraft,
Changing
Public Life,
Lucid and
Engaging,
Intellectual
Pleasure.

Abstract

In 1932, Rabindranath Tagore traveled to Persia (modern-day Iran) upon receiving an invitation from the Persian King, Pahlavi Shah. He chronicled his experiences of this journey in his travelogue titled 'Parasye' (In Persia).

The travel-loving poet did not merely enjoy the pleasures of the journey. The travelogue reflects how deeply the communal issues in contemporary British-occupied India had troubled him. The value of this work is multifaceted; 'Parasye' serves as a profound testament to Tagore's deep reflections on India.

In this account, while the evolving public life and state of contemporary Persia are vividly portrayed, Tagore's literary prowess makes the narrative lucid and engaging. In essence, reading Rabindranath's 'Parasye' provides the reader with a sense of intellectual pleasure.

Discussion

বিংশ শতকের তৃতীয় দশক ভারতবর্ষে গভীরতম সাম্প্রদায়িক সমস্যার কাল। ১৯২৭ সালে ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে সাইমন কমিশন গঠন করা হয়। এই সময় থেকেই ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকরা আপন আপন শ্রেণি স্বার্থরক্ষায় সচেতন হয়ে ওঠেন। বড়োলাট এই অবস্থা উপলব্ধি করে ভারতসচিব ওয়েজ উডবেনের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেন ভারতবর্ষের সকল দলকে নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক করা হবে। এই বৈঠকে ‘ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস’ সম্মত সংবিধান বিষয়ে আলোচনা হবে কিনা তা কংগ্রেস জানতে চাইলে কূটনীতিক ইংরেজদের কাছ থেকে উত্তর আসে -

“The conference is not meet not to discuss when dominion status is to be established, but to frame a scheme of dominion constitution for India.”^১

বলাবাহুল্য, ব্রিটিশ শাসকের এই উত্তরে আশাহত হয়ে কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠক বর্জন করে। কংগ্রেস একটি চরম অবস্থান নেয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ১৯৩০ সালে ২৬ জানুয়ারি সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ঐ একই সময়ে গান্ধিজি আইন অমান্য আন্দোলনের সক্রিয় হয়ে ওঠেন। (১৯৩০, ফেব্রুয়ারি)। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যার দিনটিকে স্মরণ রেখে এপ্রিল মাসের শুরুতেই গান্ধিজি সবারমতী আশ্রম থেকে লবণ আইন ভঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন সত্যাগ্রহীকে নিয়ে যাত্রা করেন। বলাবাহুল্য গান্ধিজির আইন অমান্য আন্দোলন সব জায়গায় অহিংস থাকল না। ব্রিটিশ সরকার দমন-পীড়নের শাসন চালু করল। এই সময়ের ঘটনা (১৮ এপ্রিল, ১৯৩০) মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। সশস্ত্র সংগ্রামীর দল গান্ধিজির নেতৃত্বে ক্রমশ আস্থা হারাচ্ছিল এই ঘটনা তার প্রমাণ। সরকার মাস্টার দা সূর্যসেনকে গ্রেফতার করে এবং তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে অতি সক্রিয় হওয়ার কারণে তিন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবককে ফাঁসিতে ঝোলানো হল। সর্বত্র গান্ধিটুপি নিষিদ্ধ করা হয়। গান্ধিজি, নেহেরু কারাগারে নিষ্কিণ্ড হলেন। দেশের রাজনৈতিক এই অশান্ত পরিবেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একটি কুৎসিত চেহারা নেয়। ঢাকা এবং চট্টগ্রামে এই দাঙ্গার সূত্রপাত হয় একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর পুলিশি অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই সময় এক অত্যাচারী দারোগা আসানুল্লাহকে হরিপদ ভট্টাচার্য নামে এক কিশোর গুলি করে হত্যা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। দেশের এই অশান্ত পরিবেশ রবীন্দ্রনাথকে কী পরিমাণ বিচলিত করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই সময়ে লেখা হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে -

“চট্টগ্রামের বিবরণটা আমার ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের নিজের দেশের লোক নির্মম হয়ে যখন এরকম মানবিক কাণ্ড করে তখন কোথাও কোনো সাঙ্কনা দেখি নে।”^২

এর অনতিকাল পরেই কবির পারস্য যাত্রা। বলাবাহুল্য, পারস্য ভ্রমণ বৃত্তান্তে অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে সাম্প্রদায়িক ভারতবর্ষের কথা। রবীন্দ্রনাথ পারস্যে নতুন রাজার শাসনে দেশের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও ঐক্য দেখেছিলেন তা কবিকে অভিভূত করেছে। কবি ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা ভেবে ব্যথিত হয়েছেন। আহ্বান জানিয়েছেন পারস্য যে মন্ত্র বলে ধর্মকে পাশ কাটিয়ে মানবধর্মের উপাসক হতে পেরেছে, সেই জাগ্রত বিবেক পারস্যের মানুষ ভারতবর্ষে এসে মানবতাবাদের কথা শোনাক। পারস্যে অবস্থানরত কবির বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা বা পারস্যরাজ, রাজমন্ত্রী এবং বিদগ্ধমন্ডলীর সঙ্গে আলাপচারিতায় ভারতবর্ষের সমস্যার কথা বারবার উঠে এসেছে।

১৯৩২ সালে এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ পারস্যে যাত্রা করেন। সঙ্গী ছিলেন বউমা প্রতিমা দেবী এবং কর্মসহায়ক রূপে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্তী। কবি আকাশপথে কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করেন। দিনটি ছিল ১১ এপ্রিল। উড়োজাহাজ এলাহাবাদ, যোধপুর এবং করাচি হয়ে ১২ এপ্রিল পারস্যে প্রবেশ করে। জাস্তে পৌঁছানোর আগেই বুশেয়ারের গভর্নরের কাছ থেকে অভ্যর্থনা এল। পারস্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এখানকার মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু ধর্মীয় সংস্কারের দ্বারা পারস্যে যে মোহাবিষ্ট নয়, সেখানে পা রেখেই কবি তা উপলব্ধি করেন। প্রাচীন সংস্কারপন্থী পারসিকদের এই অবস্থায় পৌঁছাতে নতুন রাজা পহলবি শাহের একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে, যার আহ্বানে সাড়া দিয়েই কবির পারস্যে আগমন। বুশেয়ার যাবার আগে পানশালায় আশ্রয়রত রাজকর্মচারী দলের সঙ্গে আলাপচারিতায় কবি উপলব্ধি করেছেন পারস্যে পুরাতন খোলস পরিত্যাগ করে ‘নতুন প্রাণের পালা’ আরম্ভ হয়েছে। অতীতের আবর্জনামুক্ত সমাজ, সংস্কারমুক্ত হৃদয়, এবং জগতের প্রতি মোহমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পারস্যে চলিত। এখানে পরধর্মসহিষ্ণুতা তার আদর্শ কিছুকাল পূর্বেও অনুসৃত হয়নি, কিন্তু বর্তমান শাসকের আমলে সকলেরই সমান অধিকার। বিশেষ করে নতুন শিক্ষা প্রণালী প্রচলন হওয়ার পর ধর্মীয় সংস্কার অনেকাংশে মুক্ত হয়েছে। কবি রাজকর্মচারীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানতে পারেন, পারস্যে মোল্লাতন্ত্রের অবসান হয়েছে। ইতিপূর্বে যেকোনো শ্রেণির লোক (ধর্মবিদ্যালয়ের ছাত্র, কোরান পাঠক ধর্মপ্রচারক, সৈয়দ বংশীয় যে কেউ) মোল্লাদের মতো পাগড়ি বা সাজসজ্জা ধারণ করত। নতুন শিক্ষাপ্রণালী চালু হওয়ার পর যে কেউ মোল্লার বেশ ধারণ করতে পারে না। এই বেশের অধিকার আছে একমাত্র পরীক্ষায় পাশ করা অথবা প্রকৃত

ধার্মিকদের, অবশ্য তাও ধর্মশাস্ত্রবিদ পন্ডিতের সম্মতি অনুসারে। এই নতুন আইন প্রবর্তনায় এখানকার নব্বই শতাংশ লোকের এই পোশাক পরা বন্ধ হয়ে গেছে। বিস্মিত কবি ভেবেছেন ধর্মীয় সংস্কারের অধীনে নিমজ্জিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষের কথা -

“অন্তত একবার কল্পনা করতে দোষ নেই যে, হিন্দু ভারতে যত অসংখ্য পাণ্ডা পুরোহিত ও সন্ন্যাসী আছে কোনো নূতন আইনে তাদের উপাধি-পরীক্ষা পাস আবশ্যিক বলে গণ্য হয়েছে।”^৭

প্রগতিশীল রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এসেছে -

“কে যথার্থ সাধু বা সন্ন্যাসী কোনো পরীক্ষার দ্বারা তার প্রমাণ হয় না স্বীকার করি, কিন্তু স্বেচ্ছাগৃহীত উপাধি ও বাহ্য বেশের দ্বারা তার প্রমাণ আরও অসম্ভব। অথচ সেই নিরর্থক প্রমাণ দেশ স্বীকার করে নিয়েছে। কেবলমাত্র অপরিষ্কৃত সাজের ও অনায়াসলব্ধ নামের প্রচারে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের মাথা নত হচ্ছে বিনা বিচারে এবং উপবাসপীড়িত দেশের অগ্রমুষ্টি অনায়াসে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, পরিবর্তে অধিকাংশস্থলে আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কোনো প্রতিদান নেই।”^৮

রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ মতামত, সাধুতা ও সন্ন্যাস যদি নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য হয় তাহলে বেশ পরিধান করবার প্রয়োজন নেই। ধর্মকে যদি জীবিকার বাহন করে নেওয়া হয় এবং বিশেষ বেশ ও বিশেষ ব্যবহারের দ্বারা ধার্মিকতার বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় তবে সেই বিজ্ঞাপনের সত্যতা বিচারের অধিকার সমাজের আছে।

পারস্য চিরকাল কবিদের সমাদর করেছে। বিখ্যাত কবি সাদি, হাফিজ এই দেশে জন্মেছেন। যাদের সঙ্গে কবির পরিচয় বাল্যকাল থেকেই। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন পারস্যের কবি হাফিজের অনুরাগী। পারস্যে এসে কবিকে ভালো লেগেছে অন্য একটি ব্যাপারে। ভারতবর্ষে কবিদের সমাদর মূলত সভা-সমিতি এবং সাহিত্যরসিকদের কাছে। কিন্তু পারস্যে সেই সীমাকে অতিক্রম করেছে। এখানকার রাজা ও রাজকর্মচারীর দলও কবিতার সমান অনুরাগী। কবি পারস্যিকদের সঙ্গেও একাত্মতা অনুভব করেছেন। তিনি বলেছেন, এদের কাছে আমি শুধু কবি নয়, প্রাচ্য কবি। পারস্যিকদের কাছে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ইন্ডো-এরিয়ান। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে এদের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। দেশকালের সীমা অতিক্রম করে ভাবতে পেরেছেন -

“এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ। ... কাছের মানুষ বলে এরা যখন আমাকে গ্রহণ করেছে তখন ভুল করেনি এরা, সত্যই সহজে এদের কাছে এসেছি।”^৯

পারস্যের অতিথি পরায়ণতায় কবি মুগ্ধ হয়েছেন। তারা যে অন্য সম্প্রদায়ের, ভিন্ন সংস্কৃতির, তাদের আচরণে তা কোথাও প্রকাশ পায়নি। আর এই কারণেই ইউরোপীয় সভ্যতা ও ভারতবর্ষের হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে তুলনা টেনে কবি বলেছেন -

“যুরোপীয় সভ্যতায় সামাজিক বাঁধা নিয়মের বেড়া, ভারতীয় হিন্দু সভ্যতায় সামাজিক সংস্কারের বেড়া আরও কঠিন। বাংলার নিজস্ব কোন থেকে বেরিয়ে পশ্চিমেই যাই, দক্ষিণেই যাই, কারও ঘরের মধ্যে আপন স্থান করে নেওয়া দুঃসাধ্য, পায়ে পায়ে সংস্কার বাঁচিয়ে চলতে হয় — এমনকি, বাংলার মধ্যেও। এখানে অশনে আসনে ব্যবহারে মানুষে মানুষে সহজেই মিশে যেতে পারে। এরা আতিথেয় বলে বিখ্যাত। সে আতিথেয় পংক্তিভেদ নেই।”^{১০}

কবি ১৭ এপ্রিল পারস্যের সিরাজ পৌঁছান। সেখানে অপরাহ্নে সাদির সমাধি প্রাঙ্গণে কবির অভ্যর্থনা সভা হয়। পরের দিন সকালে হাফিজের সমাধিক্ষেত্রে যান। হাফিজের কাব্যগ্রন্থ কবির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এখানকার সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, হাফিজের সমাধিতে এসে চোখ বন্ধ করে কোনো বিশেষ ইচ্ছা পোষণ করে গ্রন্থের পাতা উল্টিয়ে যে কবিতাটি চোখে পড়বে সেখান থেকে তার সেই ইচ্ছার সফলতা নির্ণয় হবে। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যা কবিকে এতটাই বিচলিত করে রেখেছিল যে কবি চোখ বন্ধ করে এই বিশেষ ইচ্ছাটি পোষণ করেন, ধর্মনামধারী অন্ধতার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে যেন

ভারতবর্ষ মুক্তি পায়। এরপর হাফিজের গ্রন্থ খুলে যে পাতাটি চোখে পড়ল সেই পাতার কবিতাটি দুটি ভাগ। প্রথম ভাগের কবিতাটি একটি রূপকাক্ষরী কবিতা। দ্বিতীয় কবিতাটি সঙ্গে কবির ইচ্ছার বিস্ময়কর মিল। তার তর্জমা করলে দাঁড়ায় -

“স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেই সঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি, এও কি সম্ভব? অহংকৃত ধার্মিক নামধারীদের জন্যে যদি তা বন্ধই থাকে তবে ভরসা রেখো মনে ঈশ্বরের নিমিত্তে তা যাবে খুলে।”^৭

সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে হাফিজের এই কবিতায় মানব মনের জটিল গ্রন্থি খুলে যাওয়ার যে প্রত্যয় রয়েছে তা কবিকে মুগ্ধ করেছে। দেশ-কাল ও ধর্মের সীমা পেরিয়ে কবি হাফিজের সঙ্গে গভীর একাত্মতা অনুভব করেছেন।

“মনে হল আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের পেয়ালা ভরতি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ঞ্জুকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারে নি; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধপ্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হল, আজ কত-শত বৎসর পরে জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফিজের চিরকালের জানা লোক।”^৮

২ মে কবির সঙ্গে পারস্যরাজ রেজা শাহ পহলবি শাহের সাক্ষাৎ হয়। রাজার সঙ্গে তার খাস কামরায় একঘণ্টা আলাপচারিতায় অনেক বিষয় উঠে আসে, যার একটি বড়ো অংশ জুড়েই ছিল ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা। পরে রাজমন্ত্রী সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। কবি রাজা ও রাজমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁদের মহানুভবতা উপলব্ধি করেন। পারস্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধি থেকে সরে এসে মানবমুক্তির সাধনায় যে নিয়োজিত এ নিয়ে কবি মন্ত্রীর কাছে প্রশংসা করলে মন্ত্রী উত্তর দেন মানুষের মনুষ্যোচিত সম্বন্ধ সহজ ও ভদ্র না হওয়াটাই অসংগত। তিনি এও জানান, পারস্য যে আজ রাজা পহলবি শাহের নেতৃত্বে উন্নতি সাধন করেছে, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে স্থান দেয়নি তার অন্যতম কারণ, পারস্য জাতির এক কোটি বিশলক্ষ মানুষের ধর্ম ও ভাষা এক। পারস্যের সমস্যা অনেক সরল ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি জনগণের ধর্ম-ভাষা ও জীবনচরণ এতটাই আলাদা যে তাদের সহজে একত্রিত করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথও সেকথা উপলব্ধি করেছেন। কবি অনুভব করেছেন, -

“ঐক্যটাই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বেশি চাই, অথচ ঐটের বাধা আমাদের হাড়ে হাড়ে। ভারতীয় মুসলমানের গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে একান্ত কঠিন করে বাঁধে, বাইরেকে দূরে ঠেকায়; হিন্দুর গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে হাজারখানা করে, তার উপরেও বাইরের সঙ্গে তার অনৈক্য। এই দুই বিপরীতধর্মী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমাদের দেশ। তা যেন দুই যমজভাই পিঠে পিঠে জোড়া; একজনের পা ফেলা আর-একজনের পা ফেলাকে প্রতিবাদ করতেই আছে। দুজনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করাও যায় না, সম্পূর্ণ এক করা অসাধ্য।”^৯

হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিরপেক্ষ সমদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, পারস্যের মোল্লাদের সঙ্গে কবির আলাপচারিতায়। মোল্লাদের প্রধান কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন - নানা জাতির নানা ধর্মগ্রন্থে নানা পথ নির্দেশ করে, তার মধ্যে সত্য পথ নির্ণয় করা যায় কী উপায়ে। কবি উত্তর দেন, -

“ঘরে দরজা জানালা সব বন্ধ করে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'আলো পাবো কী উপায়ে' তাকে কেউ উত্তর দেয় চকমকি ঠুকে — কেউ বলে তেলের প্রদীপ, কেউ বলে মোমের বাতি, কেউ বলে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে। সেই-সব উপকরণ ও প্রণালী নানাবিধ, তার ব্যয় যথেষ্ট, তার ফল সমান নয়। যারা পুঁথি সামনে রেখে কথা কয় না, যাদের সহজবুদ্ধি, তারা বলে 'দরজা খুলে দাও'। ভালো হও, ভালোবাসো,

ভালো করো, এইটেই হল পথ। যেখানে শাস্ত্র এবং তত্ত্ব এবং আচারবিচারের কড়াকড়ি সেখানে ধার্মিকদের অধ্যবসায় কথা-কাটাকাটি থেকে শুরু করে গলা-কাটাকাটিতে গিয়ে পৌঁছয়।”^{১০}

ধর্মের আচার ও নিয়মনীতিকে সরিয়ে ঈশ্বরকে সহজভাবে সাধনার কথা কবি শান্তিনিকেতনের প্রবন্ধাবলীতে একাধিক জায়গায় বলেছেন। পারস্যে এসে মোল্লাদের সভায় দ্বিধাহীনভাবে সেকথাই উচ্চারণ করছেন তিনি।

পারস্যে যেভাবে কর্মপ্রবাহ চালিত হয়েছে, তার বাস্তব রূপটি দেখে কবি অভিভূত হয়েছেন। ভারতবর্ষ থেকে আগত কবিকে তাঁরা যেমন সাদরে গ্রহণ করেছেন তেমনি এদের কর্মে ও চিন্তায় সম্প্রীতিবোধের অসংখ্য নিদর্শন পেয়েছেন কবি। পারস্য ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে সাহাবাদে পৌঁছে কবি আপামর মানুষের কাছে অভ্যর্থনা পেয়েছেন। যাদের মধ্যে ছিল রাজনৈতিক কর্মী, খবরের কাগজের সম্পাদক, সাহিত্যিকবর্গ, প্রবাসী ভারতীয় এবং অগণিত সাধারণ মানুষ। কবি প্রবাসী ভারতীয়দের মুখে শোনেন ভারতীয় বা সম্পূর্ণ অন্য ধর্মাবলম্বী হলেও পারস্যের মুসলমানদের সঙ্গে তাদের আন্তরিক সম্পর্কের কোনো অভাব ঘটেনি। সাম্প্রদায়িক ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করে কবি ভেবেছেন, মুসলিম প্রধান দেশগুলিতে (ইজিপ্ট, তুরস্ক, ইরাক, পারস্য) সর্বত্রই ধর্ম মনুষ্যত্বকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। কেবল ভারতবর্ষে চলার পথে হিন্দু-মুসলমানের সীমানায় ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাগদাদের সাহিত্য সভায় ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির জন্য কবি পারস্যবাসীকে আহ্বান জানান। আরব্য-সংস্কৃতির যে ধারা পারস্যে বহমান তা একসময় ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল। শিক্ষায়-দীক্ষায়, জীবনে চলার পথে এই সংস্কৃতি মানুষকে পথ দেখিয়েছিল। শুধু তলোয়ার দিয়ে নয়, ইসলাম ধর্মের মহতী বাণী নিয়ে আরবরা বিশ্বজয় করেছিল। আরব্য সংস্কৃতির এই আদর্শ ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে এখনও অবশিষ্ট আছে বলে কবি বিশ্বাস করেন। কবির মনে হয়েছে পারস্য এই আরব্য-সংস্কৃতিকে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছে। আর তাই কবি পারস্যকে আহ্বান জানিয়েছেন ‘আরব্যের নববাণী’ ভারতবর্ষে পাঠানোর জন্য।

“আরব সাগর পার করে আরব্যের নববাণী আর - একবার ভারতবর্ষে পাঠান — যাঁরা আপনাদের স্বধর্মী তাঁদের কাছে - আপনাদের মহৎ ধর্মগুরুর পূজ্য নামে, আপনাদের পবিত্র ধর্মের সুনামআ রক্ষার জন্য। দুঃসহ আমাদের দুঃখ, আমাদের মুক্তির অধ্যবসায় পদে পদে ব্যর্থ; আপনাদের নবজাগ্রত প্রাণের উদার আহ্বান সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে অমানুষিক সহিষ্ণুতা থেকে, উদার ধর্মের অবমাননা থেকে, মানুষে মানুষে মিলনের পথে, মুক্তির পথে নিয়ে যাক হতভাগ্য ভারতবর্ষকে।”^{১১}

সমকালে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে কবি কী পরিমাণ বিচলিত ছিলেন এই অভিভাষণ তার প্রমাণ। পারস্যের রাজা, মন্ত্রী এমনকি বেদুইন দলপতির সঙ্গে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে বারবার আলাপচারিতায় কবির সেই উদ্বেগ ধরা পড়েছে। বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে কবি শুধুমাত্র ভ্রমণের আনন্দটুকু উপভোগ করতে পারতেন, কিন্তু আমরা দেখি ভ্রমণরত কবি বারবার উদ্বিগ্ন হয়েছেন পরাধীন ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা চিন্তা করে। রবীন্দ্রনাথের ‘রাশিয়ার চিঠি’, ‘জাপানযাত্রী’ ইত্যাদি রচনায় যেমন তার নিদর্শন পাই, ‘পারস্যে’ ভ্রমণবৃত্তান্তও তার ব্যতিক্রম নয়। এই সমস্ত রচনায় সম্প্রীতির উপাসক, রবীন্দ্রনাথকে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

রবীন্দ্র জীবনের অন্তিমপর্বে পারস্য ভ্রমণ তাঁর সম্প্রীতিবোধের অন্যতম নিদর্শন হয়ে রয়েছে। এই পর্বে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চেহারা দেখে কবি ব্যথিত হয়েছেন। উৎকণ্ঠিত হয়ে মনে প্রাণে কামনা করেছেন তা অবসানের। সাম্প্রদায়িক ভাবনার উর্ধ্বে উঠে সর্বলোকের মিলন কবির জীবনব্যাপী সাধনার অঙ্গ ছিল। কবির ‘পারস্যে’ ভ্রমণকথা তাই শুধুমাত্র সেই সময়ের প্রেক্ষিতেই শুধু বর্তমান ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সংকটের প্রসঙ্গেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মাঘ, ১৪২৩ (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯), পৃ. ৪৪১

-
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত চিঠি, চিঠিপত্র: ৯৪ পত্রসংখ্যা ৩৯, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ, ১৪১৮ (প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৭১), পৃ. ৮৭
 ৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পারস্যে, রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাবিংশ খণ্ডঃ বিশ্বভারতী প্রকাশনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ (প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৩), পৃ. ৪৩৮
 ৪. ঐ, পৃ. ৪৫১
 ৫. ঐ, পৃ. ৪৫১
 ৬. ঐ, পৃ. ৪৫১
 ৭. ঐ, পৃ. ৪৬১
 ৮. ঐ, পৃ. ৪৯১
 ৯. ঐ, পৃ. ৪৮৪
 ১০. ঐ, পৃ. ৪৮৪
 ১১. ঐ, পৃ. ৪৯৬